স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি

(স্বামী শুদ্ধানন্দ-লিখিত প্রবন্ধ: ১৩২০ সালে আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত।)

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তখন ২।৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি, কোনরূপ অর্থোপার্জনাদিও করি না, সুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্মতলায় 'ইন্ডিয়ান মিরর' অফিসের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁহার যে-কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মাদ্রাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা -- বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিস্ট প্রভৃতি -- যাঁহার যেরূপ ভাব তদনুসারে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেহ বা মুরুব্বিয়ানা ধরনে -- যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহারও প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাঁহার শ্রীমূর্তি-দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে, তাই প্রত্যূষে উঠিয়াই শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এত প্রত্যূষেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ইংরেজীতে মুদ্রিত দুইটি কাগজ বিতরিত হইতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, তাঁহার লন্ডনবাসী ও আমেরিকাবাসী ছাত্রবৃন্দ বিদায়কালে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান করেন, ঐ দুইটি তাহাই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। স্টেশনপ্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজীর আসিবার আর কত বিলম্ব? শুনা গেল, তিনি একখানা স্পেশাল ট্রেনে আসিবেন, আসিবার আর বিলম্ব নাই। ঐ যে -- গাড়ির শব্দ শুনা যাইতেছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল।

স্বামীজী যে গাড়িখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মদুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যেই গাড়ি থামিল, দেখিলাম স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মূর্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তারপরেই অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া কিছুদূরবর্তী একখানি গাড়িতে উঠাইলেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতই 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজী-কী জয়', 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-কী জয়' -- এই আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন স্টেশনের বাহিরে পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্য পারিলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়ির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনাম-সঙ্কীর্তনদলকে দেখিয়াছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যান্ডপার্টি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজীর সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। রিপন কলেজ পর্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা, পাতা ও পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল। গাড়ি আসিয়া রিপন কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইবার স্বামীজীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, তিনি মুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির

হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র। দুইখানি গাড়ি -- একটিতে স্বমীজী এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার; মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র হাত নাড়িয়া জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটিতে গুডুইন, হ্যরিসন (সিংহল হইতে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্মালম্বী সাহেব), জি. জি., কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ গাড়ি দাঁড়াইবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামীজী রিপন কলেজ-বাটীতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া দু-তিন মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়িতে উঠিলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হইল না। গাড়ি বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। আমিও মনে মেন স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

* * *

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ) বাটীতে গেলাম। সেখান হইতে খগেন ও আমি তাহাদের আকখানি টমটমে চড়িয়া পশুপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্মামীজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশি লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করিয়া দিলেন -- 'এরা আপনার খুব admirer (মুগ্ধ ভক্ত)'।

স্বামীজী ও যোগানন্দ-স্বামী পশুপতি বাবুর দ্বিতলস্থ একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুইখানি চেঢারে বসিয়াছিলন। অন্যান্য স্বামিগণ উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। স্বমীজী যোগানন্দ-স্বামীর সহিত তখন কথা কহিতেছিলেন। আমেরিকা-ইওরোপে স্বামীজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। স্বামীজী বলিতেছিলেন:

দেখ্ যোগে, দেখলুম কি জানিস? -- সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest (প্রকাশ) করেছিলেন, আর অধুলিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।

খগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।'

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করিলেন, 'এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsia-তে (পুরানো অজীর্ণরোগে) ভুগছে।'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের বাঙলা দেশটা বড় sentimental (ভাবপ্রবণ) কি-না, তাই এখানে এত dyspepsia.'

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।

স্বামীজী এবং তাঁহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে অনস্থান করিতেছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া কয়েকদিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয় -- প্রথম এই বাগানবাটীর একটি ঘরে। স্বামীজী আসিয়া বসিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না -- স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই তামাক খাস্?'

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে না।'

তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'হাঁ, অনেকে বলে -- তামাকটা খাওয়া ভাল নয়; আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।'

আর একদিন স্বামীজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত স্বামীজী কথা কহিতেছেন। আমি একটু দূরে রহিয়াছি, আর কেহ নাই। স্বামীজী বলিতেছেন, 'বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী -- অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী -- সর্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।' তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, 'যে-সব ধর্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের তেমন প্রচার নেই, তাদের ভেতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে -- যথা বল্লভাচার্য সম্প্রদায়।'

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন, এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী কথাবার্তা কহিতেছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলিতেছে, 'আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি -- নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।'

স্বামীজী অতি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন, 'দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মতো অবস্থা ছিল; তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি বা কি রকম করেছিলে বল দেখি?'

যুবক বলিতে লাগিলেন; 'মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক একজন পন্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মূর্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তা সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা-অর্চনা করতে লাগলুম, কিন্তু তাতে শান্তি পেলম না। সে সময়ে একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করবার চেষ্টা কর দেখি -- তাতে শান্তি পাবে।' আমি দিন-কতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম, কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হল না। আমি মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না বলতে পারেন, কিসে শান্তি হয়?'

স্বামীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বাপু আমার কথা যদি শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ-পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে -- তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তাহলে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে

তুমি মনের শান্তি পাবে।'

যুবকটি বলিল, 'আচ্ছা মহাশয়, ধরুন -- আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে?'

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সহিত স্নেহপূর্ণ স্বরে সহানুভূতির সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন! এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন -- 'দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন করে রোগীর সেবা কোনকালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।'

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হইল না।

আর একদিন মাস্টার[১] মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। মাস্টার মহাশয় বলিতেছেন, 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে তো মায়ার রাজের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ -- সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?'

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?'

মাস্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

টমাস আ কেম্পিস-এর 'Imitation of Christ-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী সংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা-সর্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সূচনা লিখিয়া 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের উপর এখন কিরূপ ভাব জানিবার জন্য -- উহার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিলেন, 'নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে?' স্বামীজী শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়!'

গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া স্বামীজী সাধনরাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন!

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহার সাহায্যেও তিনি উচ্চ ধর্মভাব প্রচারের চেষ্টা করিতেন।

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' - প্রণেতা শ্রীম

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁহাকে 'রামলাল-দাদা' বলিয়া নির্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন স্বামীজীর সহিত দেকা করিতে আসিয়াছেন। স্বামিজী একখানি চেয়ার আনিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আপনি বসুন, আপনি বসুন।' স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাড়িবার পাত্র নহেন, অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।'

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। স্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার দুটা কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে ছেলেদের বসিতে বলা যায় -- কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। স্বামীজীর মনে হইতেছিল, ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হিত। কিন্তু আবার বুঝি তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তা বৈশ, তোমরা বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্যা করা ভাল।'

আমাদের পাড়ার চন্ডীচরণ বর্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চন্ডীবাবু Hindu Boys School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী, সেখানে ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপনা করান হয়। তিনি পূর্ব হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, পরে স্বামীজীর বক্তৃাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন।

চন্ডীবাবু আসিয়া স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?'

স্বামীজী বলিলেন, 'যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ -- বলে দিয়েছিলেন।'

চন্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পরলে কি কামদমনের বিশেষ সহায়তা হয়?'

স্বামীজী বলিলেন, 'একটু-আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি জান -- যতক্ষণ লোকে সেও অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায়-অবমম্বনের চেষ্টা স্বভাবতই করে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকোতে অনেক দিন লাগে।'

চন্ডীবাবু একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ইংরেজীতে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'Oh Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful -- how to conquer lust.'

স্বামীজী চন্ডীবাবুকে শান্ত ও আশস্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenter-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, 'লন্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক Socialist Democrat প্রভৃতি আসতেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্মের তাঁদের

নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।'

স্বামীজী উক্ত কার্পেন্টার সাহেবের 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চন্ডীবাবুর ছবিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল, বলিলেন, 'আপনার চেহারা যে বই-এ আগেই দেখেছি।' আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য উঠিলেন। উঠিবার সময় চন্ডীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চন্ডীবাবু, আপনারা তো অনেক ছেলের সংস্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?' চন্ডীবাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, স্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই; স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'সুন্দর ছেলের কথা কি বলছিলেন?'

স্বামীজী বলিলেন, 'চেহারা দেখতে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না -- আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তি-সাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।'

আর একদিন গিয়া দেখি, স্বামীজী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী[২] স্বামীজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতুহল হইল। প্রশ্নটি এই: অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি? আমরা শরৎবাবুকে স্বামীজীর নিকট ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা শরৎবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজীর নিকট যাইয়া -- তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। স্বামীজী উক্ত প্রশ্নে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা -- এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কতকাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হল না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান -- কত সাধন ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।'

আমি স্বামীজীর উক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি একজন অবতার? আরও মনে হইল, স্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন বাবু আমিদিগকে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, 'স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।' স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'উপনিষদ কিছু পড়েছ?'

আমি -- আজ্ঞা হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।

স্বামীজী -- কোন্ উপনিষদ পড়েছ?

---

[২] 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা

আমি -- কঠ উপনিষদ পড়েছি।

স্বামীজী -- আচ্ছা, কঠ-টাই বল, কঠ উপনিষদ খুব grand -- কবিত্বপূর্ণ।

আমি -- কঠ-টা মুখস্থ নেই -- গীতা থেকে খানিকটা বলি।

স্বামীজী -- আচ্ছা, তাই বল।

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ 'স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা' হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জুনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য 'বেশ, বেশ' বলিতে লাগিলেন। ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর দর্শনার্থ গিয়াছি। রাজেনকে বলিয়াছি, ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ লিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ কিছু থাকে তো পকেটে করে নিয়ে চল। যদি কালকের মতো উপনিষদের কথা পাড়েন তো তাই পড়লেই চলবে।' রাজেনের নিকট একখানি প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীকৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অদ্য অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়াছিলেন; যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও কিরূপে ঠিক স্মরণ নাই -- কঠ-উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠের অন্তরালে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা -- যে শ্রদ্ধার নির্ভীকচিত্তে যমভবনেও সাহসী হইয়াছিলেন -- বলিতে লাগিলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর -- স্বর্গ-প্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন সেইখানটা বেশি না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন।

নচিকেতা বলিলেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ -- দেহ গেলে কিছু থাকে কিনা, তারপর যমের নচিকেতাকে প্রলোভন-প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান। এই-সব খানিকটা পড়া হইলে স্বামীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন!

কিন্তু এই দুইদিনের উপনিষদ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যখনই সুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব সুর লয় তাল ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক-একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই -- তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা:

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।'[৩]

-- সেই একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হয় -- বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, থখন যেন শুনিতে পাই -- স্বামীজী সেই

[৩] মুন্ডক উপ., ২।২।৫

আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন:

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।[৪]

-- সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এই-সব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না -- এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনিই প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে -- তাঁহার প্রখাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই -- স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন:

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
* *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।[৫]

-- হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি -- যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে -- মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

* * *

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচ দিন হইল বাড়ি ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন -- সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি. জি. প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, 'এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।'

---

[৪] কঠোপনিষদ, ২।২।১৫
[৫] শ্বেতাশ্বতর উপ., ২।৫, ৩।৮

স্বামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ -- একটা নিয়ম করা ভাল বইকি। ডাক সকলকে।' সকলে আসিয়া বড় ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, 'একজন কেউ লিখতে থাক, আমি বলি।' তখন এ উহাকে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল -- কেহ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধন-ভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা -- এইটিই সার; আর লেখাপড়াটা -- উহাতে মানযশের ইচ্ছা আসিবে, যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচারকার্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন তো নাই-ই, বরং উহা হানিকর -- এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরোয়া -- আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি থাকবে?' (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে তথায় থাকিব অথবা দুই-এক দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব?) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, 'হাঁ।' তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেষের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, এই-সব নিয়ম করে হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে -- সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতাই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে -- সু-নিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হবে।'

তারপর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না -- এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'দেখ একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ -- দেখিস, যদি কোন নিয়মটা negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) করে দিবি।'

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল -- লোককে খারাপ বলা বা তাহার বিরুদ্ধে কু-সমালোচনা করা, তাহার দোষ দেখান, তাহাকে 'তুমি, অমুক করো না, তমুক করো না' -- এইরূপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না; কিন্তু তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষগুলি আপনা-আপনি চলিয়া যায়। ইহাই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া লইবার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশমতো যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটির সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম, আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকদ্রব্য সম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল -- 'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত 'না'-টিকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তখন প্রথম দাঁড়াইল -- 'সকলে তামাক খাইবেন।' কিন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তাহারও উপর) তামাক খাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইরূপ দাঁড়াইল -- 'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন'। যাহা হউক, এখন মনে হইতেছে -- আমরা একটা বিকট আপোস করিয়াছিলাম। Detail-এর (খুঁটিনাটির) ভিতর আসিলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না; তবে ইহাও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামীজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বড় ঘরে একঘর লোক। ঘরের মধ্যে স্বামীজীর অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ (আলিপুর আদালতের সবনামখ্যাত উকিল) মহাশয়ও আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায় -- এমন কি, কখন কখন কংগ্রেসে দাঁড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বক্তৃতাশক্তির কথা কেহ স্বামীজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামীজী বলিতেন, 'তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন -- এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা -- Soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা), তাই খানিকটা বল।' বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন -- স্বামীজী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ-উপরিধের পরও যখন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙিতে কৃতকার্য হইলেন না, তখন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয়বাবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্বে কখন কখন ধর্মসম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা করিতাম, আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল, তাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার সম্বন্ধে এই-সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, আমি পূর্বে বলিয়াছি, আমি অনেকটা বেপরোয়া। আমাকে আর বেশি বলিতে হইল না। আমি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া 'আত্মা' সম্বন্ধে প্রায় আধঘন্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হইতেছে, এ-সকল খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে লিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করিয়া বেশ গম্ভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া যাহাতে তাহার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন। ... কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, 'I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant -- must, that is my word!' -- আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে -- হইতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

সেই সময় স্বামীজীর ইংলন্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লন্ডন হইতে ই. টি. স্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে -- মঠেও উহার দু-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই -- আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ নরেন বেদান্তসম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphlet-গুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন, 'এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি!' তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন -- এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দু-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ

আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? বহুদিন পূর্ব হইতেই আমি রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হইয়াছিল যে, ভক্তি জ্ঞান বা কর্মযোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতাম। মনে ভাবিতাম, মঠের সাধুরা যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁহারা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় যে, স্বামীজী শুধু জে রাজযোগে বিশেষ পটু তাহা নহেন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যে-সকল ধারণা ছিল, সে-সকল তো তিনি উত্তমরূপেই বুঝিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সহিত রাজযোগের সম্বন্ধও অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম কারণ হইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, 'বাঙলা দেশে রাজযোগের চর্চার একান্ত অভাব -- যাহা আছে, তাহা দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়।'

যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

একদিন অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামীজীর খেয়াল হইল, গীতা পাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদগ্রীব হইয়া স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দুই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশ স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা 'গীতাতত্ত্ব' নামে প্রথমে 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ভারতের বিবেকানন্দে'র অঙ্গীভূত করা হয়।[৬]

যখন স্বামীজী আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক -- কৃষ্ণার্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। তখন সময়ে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মনিয়া যায়। ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিয়াই পরে বুঝাইলেন, ধর্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গবেষণার শাস্ত্রবিবৃত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন ধর্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই? -- এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নির্ভীকভাবে এই-সকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান হইলেও তজ্জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং যদি লোকে সর্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তারপর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্বমত-সমন্বয় ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যংমাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনা-বাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং সর্বসাধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার বনে পড়িল -- 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', এ তো তোমার সাজে না -- তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি -- তাহা তো তোমার সাজে না। প্রফেটের মতো ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে -- যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ

[৬] এই গ্রন্থাবলীর ৫ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। Available in the *Complete Works of Swami Vivekananda*

করিতেছে -- তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।

এই একটি শ্লোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখাইয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, 'এই একটিমাত্র শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।'

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীনভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর।' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামীজী যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করলে সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে। কেবল আমরা ছেলেবেলা থেকে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি -- তাই ঐরকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা' শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না করে 'আত্তাঁ' এইভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ। আমরা সকলেই তো পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি। তখন নূতন ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন পরে স্বামীজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরিয়া উহার অক্ষরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, এ কথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন -- তিনি সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা করবি -- ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝবার চেষ্টা করবি -- উদাহরণস্বরূও দেখ -- 'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'[৭] -- এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।'

স্বামীজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা' সূত্রটি আসিল। স্বামীজী এই সূত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সূত্রটির প্রকৃত অর্থ এই -- যখন উপনিষদে জগৎকারণের প্রসঙ্গ উঠাইয়া 'সোহকাময়ত' --তিনি (সেই জগৎকারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তখন 'অনুমানগম্য' (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, যাহা কোন কালে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল না, স্বামীজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন?

যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ'[৮] সূত্র আসিল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ', তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্ বলতেন, সে ঐ ভাবে বলতেন।' এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামীজী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেন: যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেবান্তের দিক দিয়ে নয়।' এই বলিয়া আবার অন্য সূত্র পড়িতে বলিলেন।

স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ফস্ করিয়া কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ চরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য

---

[৭] ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৯

[৮] ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩০

আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর -- আমি তো তাঁহার লক্ষাংশের একাংশ এখনও বুঝতে পারিনি -- ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।'

স্বামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধন-ভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথম সকলে আসন করে বস; ভাব্ -- আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হব।' সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, 'ভাব -- আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্রের মতো দৃঢ় -- এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে -- হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের শুভকামনা হচ্ছে -- সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি; অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ -- এইটি আধঘন্টা আন্দাজ করবি'। সকলেই স্বামীজীর উপদেশমতো চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইভাবে সমবেত সাধনুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ 'এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামীজী-প্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

* * *

একদিন সকালবেলা, ৯টা-১০টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি করিতেছি -- হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) আসিয়া বলিলেন, 'স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?' আমিও বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ।' ইতঃপূর্বে আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্রগ্রহণ করি নাই। এক্ষণে নির্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না যে, সেদিন শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দীক্ষা লইতেছেন -- তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুরঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়ছিল। তারপর শরৎবাবু বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'এ দীক্ষা নেবে।' স্বামীজী আমাকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে?' আমি বলিলাম, কখনও সাকার ভাল লাগে, কখনও বা নিরাকার ভাল লাগে।'

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, 'তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।' এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তুই কখনও ঘটস্থাপনা করে পূজো করেছিস?' আমি বাড়ি ছাড়িবার কিছু পূর্বে ঘটস্থাপনা করিয়া কোন্ পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলাম -- তাহা বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলিয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'এই মন্ত্রে তোর সুবিধে হবে।' তারপর আমার সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সম্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল -- সেইগুলি লইয়া আমায় গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দলেন, তাহাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসঙ্গত। শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরু শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া মন্ত্র দেন, স্বামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হইল। স্বামীজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করিলাম।

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রতী শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি করিয়া ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসিত। 'ইন্ডিয়ান মিররে'র পিয়নের ঐ পর্যন্ত 'বিট' বলিয়া বঠের কাগজখানিও ঐখানে আসিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আশ্রমের সাহয্যের জন্য স্বামীজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন প্রভৃতি সমদয় কার্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই 'ইন্ডিয়ান মিরর' কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্মের একটা প্রণালীপূর্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। সুতরাঙ নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহার কর্তব্য কার্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা অবকাশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, 'যেখানে ইন্ডিয়ান মিরর আসে, তোমাকে সেস্থান দেখিয়ে আনব -- তুমি রোজ গিয়ে কাগজখানি এনো।' আমিও ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্যভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে ভাবিয়া সহজেই স্বীকৃত হইলাম। একদিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদ-ধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, 'চল, সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই।' আমিও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইতোমধ্যে স্বামীজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'বেদান্তপাঠ করা যাক -- আয়।' আমি অমুক কার্যে যাইতেছি -- বলায় আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেইস্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম, আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে স্বামীজী অপরের নিকট বলিতেছিলেন, 'ছোঁড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখতে গেল নাকি?' এই কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, 'ভাই, চিনে এলুম বটে, কিন্তু কাগজ আনতে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে না।'

শিষ্যগণের -- বিশেষতঃ নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্ররক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামীজী এত সাবধান ছিলেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু-ব্রহ্মচারী কলিকাতায় বাস করে বা রাত কাটায় -- ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছলেন, সেগুলি আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে:

দেখ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাত থাকতে বলছি। তোরা যে আমার লেকচারে পড়েছিস -- 'সংসারে থেকেও ধর্ম হয়' অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে-সব লেকচারের শ্রোতৃমন্ডলী সব সংসারী, সব

গৃহী -- তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি -- ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকুও ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি।

* * *

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য হইতে পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন: ধর্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোলা থাকা আবশ্যক, এবং এই এই গুলি বন্ধ থাকা আবশ্যক, তাহার প্রবল মেধাবী হৃদয়বান ও বাগ্মী হওয়া উচিত, আর তাহার অধোদেশের কার্য যেন বন্ধ থাকে -- যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যবান হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয় গুণ আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব -- যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে মিস নোবল[৯] বিলাত হইতে শীঘ্র ভারত রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস নোবলের প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, 'বিলেতের ভেতর এমন পূতচরিতা, মহানুভবা নারী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই এ আমার কাজ বজায় রাখবে।' স্বামীজীর ভবিষ্যবাণী সফল হইয়াছিল।

* * *

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রধান লেখক, মাদ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গাচার্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, স্বামীজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। স্বামীজী মধ্যাহ্নে আমাকে বলিলেন, চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ্ দিকি; আর একটু খাবার জল নিয়ে আয়।' আমি এক গ্লাস জল স্বামীজীকে দিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিলাম, 'আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।' আমি মনে করিয়াছিলাম বিলাত বা আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামীজী অভয় দিয়া বলিলেন, 'লেখ, foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।' থখন আমি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে একখানি লেখাইলেন; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন কাহাকে -- ঠিক মনে নাই। মনে আছে রঙ্গাচার্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন -- বাঙলা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চা নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় আসিতেছেন, তখন 'give a rub to the people of Calcutta' -- কলিকাতাবাসীকে একটু উসকাইয়া দিয়া যান। কলিকাতায় যাহাতে বেদান্তের চর্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর কী দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই কলিকাতাবাসীর ধর্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামীজীর এই পত্রের ফলেই ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতাবাসিগণ স্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পন্ডিতবরের 'The Priest and the Prophet' (পুরোহিত ও ঋষি নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

* * *

[৯] সিস্টার নিবেদিতা

একটি বয়স্ক বাঙালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্যান্য সাধুবর্গ তাহার চরিত্র পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-জীবনের অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'মঠে যে-সকল সাধু আছেন, তাঁদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি।' এই কথা বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একে মঠে রাখতে তোমাদের কার কিরূপ মত?' থখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে অমত প্রকাশ করিলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না।

* * *

একদিন অপরাহ্নে স্বামীজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন -- সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্বে প্রচার-কার্যের জন্য স্বামীজী কর্তৃক মাদ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্যভার লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্যে যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিত, তাহাদিগকেও লইয়া স্বামীজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।' তখন একদিকে স্বামীজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইঁহার আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে -- নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন স্বামীজী তাঁহার ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, 'এই যে দেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁজ পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি -- ।' এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল -- কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া 'সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল?' -- ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহাকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামীজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন। গুরুভাই-এর প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামীজী বেশি গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

* * *

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, 'দেখ, মঠের একটা ডায়েরী রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা করে রিপোর্ট পাঠাবি।' স্বামীজীর এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

স্বামীজীর কথা

আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ তো স্পষ্টই স্ববিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বলতে পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত বা ব্যক্ত

এবং যুগাবসানে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হলে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখিঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদ্দা কথা এই যে, এতে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করতে খুব প্রস্তুত আছি।

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে -- সংসার দুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুললেই 'দুঃখ দুঃখ' শুনে লোকে অস্থির হয়, কিন্তু তার শেষে পরম সুখ -- যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয় জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে যথার্থ সুখ হতে পারে, এ-কথা আমরা অস্বীকার করি, আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভেতরই আছে। আমরা জগতের যে 'সুখবাদ' দেখতে পাই, যে মতে বলে -- জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে -- আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার ভাব এই যে, সে সত্য-জগতের জ্ঞান লাভ করে।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদপাঠ -- অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা জায়। সে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-অবস্থা লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জানা যায়।

জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায় -- সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

মানুষের পুনঃপুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃপুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের বিকাশ হবার সুবিধে হয়, আর বেতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

বেদান্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিস আছে।

ভক্তিলাভ কিরূপে হয়? -- ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি আপনা-আপনি প্রকাশ হবে।

জিব চললেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চলবে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম -- এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমান কালে কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

ধর্ম একটা কল্পনার জিনিস নয়, প্রত্যক্ষ জিনিস। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বই-পড়া পন্ডিতের চেয়ে বড়।

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'কিন্তু সে আপনাকে মানে না।' তাতে তিনি বলে উঠলেন, আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে ভাল কাজ করছে, এইজন্যে সে প্রশংসার পাত্র।

আসল ধর্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই।

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হবে। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

-- তোমরা দুটো জিনিস গোল করে ফেলছ। কর্ম মানে -- এক জীব সেবা, আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ছাড়া কারও অধিকার নেই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্ছে।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড়লোকের খাতির আরম্ভ হবে, সেইদিন থেকে তার পতন আরম্ভ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভাবের (feelings) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে।

গোঁড়ামি দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়ে একটি উচ্চপথে তুলে দিতে দেরি হলেও পাকা ধর্মপ্রচার হয়।

সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই (ধর্মলাভ) হয়ে যাবে।

গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য না পড়েও পন্ডিত হয়ে যায়।

গুরু কাকে বলা যায়? -- যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

আচার্য -- যে-সে হতে পারে না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান করা চাই, না হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হল, তবে তিনি তো সাধারণ লোকের মতো হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা

দেবেন? আচার্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্যদের শরীরে ব্যাধি-আদি হয়। কিন্তু কাঁচা হলে তাঁর মনকে পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য -- যে-সে হতে পারে না।

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।